শান্তিদাদু সমগ্র

নিখাদ বাঙালি

সূচিপত্র

মায়াবী	৭
খোক্কস	১৪
শান্তিদাদু	১৯
শান্তিদাদুর খেলা	২৭
কুণ্ডলিনী	৫২
সমাহর্তা	১০৪
তপুষী	১১০
পরিষ্কন্দ	১২২
খরগোশ	১২৭
মহালয়া	১৩৭
ধূপকাঠি	১৪৪
পরিধান	১৫৪
ঘূর্ণি	১৬০
পরিষেবা	১৭১
ভগ্নাংশ	১৮২

মায়াবী

টক করে আওয়াজটা হল। পায়ের কাছে।

তাকিয়ে দেখি একটা মাঝারি মাপের ঢিল।

একটু ভয় করল। ভূতের ভয় না, চোর-ডাকাতের। আমার কাছেও কিছু পাথর মজুত করা ছিল। একটা মাঝারি দেখে পাথর নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে সাঁই করে অন্ধকারে ছুঁড়ে মারলাম। পাথরটা তিরবেগে দেওয়াল টপকে ওপারে চলে গেল।

নিজের কাজে আবার মন দিলাম। নাইট শিফটে ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন চালানো যে কী চাপের, যারা করে তারাই জানে। না... এবারে একটু জায়গাটা আর আমার কাজটা আপনাদের বুঝিয়ে দিই। খড়্গপুরের গা ঘেঁষে যে হাইওয়ে সোজা মেদিনীপুর টাউন চলে গেছে, সেই রাস্তার পাশেই একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি আমি। কেন? কীসের জন্য? সেসব সুখ দুঃখের কথা থাক আজ। ছোট করে বলি, একটি আলুর চিপ্‌স বানানোর কারখানা, আর সেখানেই শিফট ম্যানেজার আমি। নামেই ম্যানেজার, কাজে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব। মূল কারখানা থেকে অফিসবাড়িটি আলাদা। মাঝে রাস্তা। ওই কাঁচামালের গাড়ি ঘোরানোর জন্য অনেক নিয়মকানুনের ব্যাপার। সেই অফিসেই রাতে একা বসে কিছু কাজ সারছিলাম। রাতের শিফটে বেশিরভাগই সব ঘুমোয়, তবে আমি প্রোডাকশনের চাপটা দেব ভোররাতে। তখনই সবার ঘুমটা ধরে কিনা।

এইসময়ই এই অতর্কিত প্রস্তরখণ্ডের আক্রমণ। ধানক্ষেতের মাঝে কারখানা, সামনে হাইওয়ে বলেছিলাম। মাঝেমাঝেই শুনেছি আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এসে কারখানার দেওয়াল টপকে তার, পাইপ, কল, লাইট এসব চুরি করে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে বন্দুকধারী দারোয়ান। আর আছি আমরা, রাত্রিকালীন কর্মচারী। তাই চোরেরা ছোট ছোট ঢিল মেরে পরীক্ষা করে নেয় জেগে আছি কিনা। প্রত্যুত্তরে বেয়ারিং পোস্টে ঢিল না পেলে চোরেরা ধরেই নিত, এই রাতটা চুরির রাত। এতদিন শুনেছিলাম শুধু, আজ ঢিলটা এসে পায়ের কাছে লাগতে একটু ভয় করতে লাগল। বলা যায় না, দল বেঁধে রে রে করে তেড়ে এলে একা কী-ই বা করব?

তাও কাজে মন দিলাম। মিনিটখানেক বাদে আবার একটা ঢিল। ওইরকম মাঝারি মাপেরই। এবার সত্যি ভয় করল। তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে। ফোন তুলে গার্ডকে ডাকার চেষ্টা করলাম। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল। সে বোধহয় গেট অফিসে বন্দুককে কোলবালিশ বানিয়ে ঘুম দিয়েছে। নাহ, ভাবনার বিষয়। একবার ভাবলাম, কারখানার ভিতরে চলে যাই। কিন্তু বসে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কারণ কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে ওখানেই... অমনি দেখি একটা ছোট মাথা অন্ধকার থেকে উঁকি মারছে। আর সেই মায়া মাখানো অথচ জ্বলন্ত নীল চোখ। একঝলক আমায় দেখে, এবং আমি যে তাকিয়ে আছি সেটা বুঝেই বোধহয় আঁধারে মাথাটা লুকিয়ে গেল।

'সেই' চোখ বললাম যখন, তখন নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, এই মাথা ও চোখের অধিকারী বা অধিকারিণীর সঙ্গে আমার আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে। হয়েছিল, তবে সেটা সাক্ষাৎ না।

সে মাসখানেক আগের গল্প। এরকমই রাতের শিফটে কাজ করছি। অত্যন্ত সাপের উপদ্রব বলে একটা টর্চ আর লাঠি সবসময় থাকেই আমার সঙ্গে। সেই রাতে, অফিস থেকে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছি মূল কারখানার দিকে। কাচের দরজা খুলে বেরোতেই বাঁ দিকের ডাস্টবিনে একটা হুটোপুটির আওয়াজ পাই। শেয়াল ভেবে যেই না টর্চ জ্বেলে লাঠিটা মুঠো করেছি, অমনি জানোয়ারটা আমার দিকে তাকাল। বেড়ালের মতো কাটা চোখ, কিন্তু এরম অদ্ভুত মায়া মিশ্রিত নীল চোখ... আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ দুটো যেন সম্মোহন করে ফেলবে। আর ওই নীল কিন্তু স্থির না, আগুনের মতো গনগন করছে। সেকেন্ড খানেকের দেখা। কুচকুচে কালো জানোয়ারটা বোধহয় টর্চের আলো দেখে বিহ্বল হয়েছিল মুহূর্তখানেক। তারপর ডাস্টবিন থেকে নেমে ছুটল। ততক্ষণে আমিও লাঠি হাতে ছুটলাম। এ জানোয়ার ভামবিড়ালই হবে। কিন্তু আকারে বেশ বড়। দৌড়ানোর কায়দাও অদ্ভুত। সামনের পা অপেক্ষাকৃত সরু আর ছোট। পেট মাটি থেকে অনেকটা উঠে। দৌড়ে দৌড়ে, কারখানার শেষের দেওয়ালে এসে গেলাম, এবং পরমুহূর্তে আমাকে অবাক করে সেই জানোয়ার প্রায় ন'ফুটের দেওয়াল অবলীয়ায় লাফিয়ে পার হয়ে গেল। দেওয়াল ধরে চড়ল না, সটান মাটি থেকে হাই জাম্প মেরে পেরিয়ে গেল। দুটো ব্যাপারে আমাকে হতবাক হতে হল। প্রথমত, টর্চের আলোয় প্রাণীটির ল্যাজ দেখেছি। ভামের মতো ঝাঁকরা নয়, বরং সরু, মাঝারি, লম্বা। আর দ্বিতীয়ত, প্রাণীটি যে দেওয়াল টপকে গেল সেদিকে আমাদের যাওয়া মানা। কারখানার মালিক বাস্তু-টাস্তু মেনে কীসব হোম-যজ্ঞ করে জায়গাটা দেওয়াল তুলে আলাদা করে দিয়েছে। এখানকার লোকেরা বলে কীসব কোন সাধুর জায়গা ছিল। প্রত্যেক কারখানা, অফিস, আদালত সব জায়গাতেই এরকম একটা গল্প ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকে।

যাই হোক, সেই এক মাস আগের পশ্চাৎধাবন ও লম্ফনের পরে প্রাণীটি আজ আবার উদয় হয়েছে। এবং ঢিল সেই ছুঁড়েছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ এক অদ্ভুত প্রজাতির ভামবিড়াল, এবং আজকে ঢিল ছোড়ার ঘটনায় আরো নিশ্চিত হলাম। কারণ অনেকদিন আগে ভামবিড়ালকে আমি নিজে দেখেছি মানুষের মতো সামনের থাবা দিয়ে কলার খোসা ছাড়িয়ে খেতে। কিন্তু লক্ষ করে ঢিল ছোড়া? নাহ, তাহলে তো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকতে হবে। আর ওকে আমিও ঢিল মেরেছি, একটু আগে, তার উত্তরে আরেকটা ঢিল মারল, তাহলে কি?

এসব ভাবনার মধ্যেই টুক করে আরেকটা জিনিস এসে পড়ল পায়ের কাছে। একটা শক্ত কষা ছোট পেয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবে জানালার বাইরে পেয়ারা গাছটার দিকে আমার চোখ গেল। ওই তো, অন্ধকারে কালো মহাশয় পেয়ারা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এর একটাই মানে হয়, এ জীব আমার ক্ষতি চায় না। এ চায় খেলতে। এবং এটি ভাম না। এটি একটি বাঁদর, একটু অদ্ভুত বাঁদর, কিন্তু যেভাবে ডাল ধরে ঝুলছে, তাতে তো বাঁদরই হবে। আমিও দিলাম পেয়ারাটা ছুঁড়ে। খেলবি আমার সঙ্গে? আয় সারা রাত পড়ে আছে আমার কাছে।

পেয়ারার ডালে কিঞ্চিত আন্দোলন হল এবং আমার দিকে একটা ডাঁশা পেয়ারা উড়ে এল। বাহ বেশ উপকারী বাঁদর তো। বেছে বেছে ভালো দেখে পেয়ারা দিয়েছে। তাও আবার এবারে একটা বাক্সর উপর ফেলেছে, যাতে ফেটে না যায়। আমার একটু মজা লাগল। এবারে আর কিছু না ছুঁড়ে, সটান টর্চ নিয়ে জ্বালিয়ে আলোটা ওর উপরে ফেললাম।

কুচকুচে কালো রঙ, বাঁদরের মতো কান নেই। আলো পড়তেই নীল চোখ একটু ছোট হল, এবং পরমুহূর্তে মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। বাঁদরের মতো দাঁত খিঁচানো হাসি নয়। মানুষের কৌতুক হলে যেরম হাসে সেরকম। এবং হাসি মুখেই আমার দিকে তাকিয়ে দুলতে লাগল সে। এবার আমার ভয় করল। এ এক অজানা জীব। আমার জ্ঞানে এরকম কোনো প্রাণী নেই যে নিজের মতে হাসতে পারে, লাফাতে পারে, মাঝরাতে খেলতে চায়। ভয় ঠিক না, কিন্তু আমি যে কী অনুভব করলাম আমিই জানি না। আশ্চর্য, অবাক, আর কিঞ্চিত ভয়— সব মিশিয়ে এক আজব পরিস্থিতি। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গার্ডকে ডেকে নিয়ে এলাম, তারপর বাকি রাত কারখানার অন্য কাজে চলে গেল।

দিনের আলো ফুটতেই মনে সাহস ফিরে এল। আলো জিনিসটা খুব আশার ওষুধ। নিজের চোখ ও মস্তিষ্ককেই সন্দেহ করতে বাধ্য করায়। তাই সাধারণভাবেই আমার মনে এই বিশ্বাস স্থির হল যে, টানা পাঁচদিন নাইট শিফট করে আমি ভামবিড়ালকেই হাসতে দেখেছি। আর ঢিল, পেয়ারা এগুলো

চোরেরাই ছুঁড়েছিল। কাউকে কিছু জানালাম না। জানালে সবাই ভাববে, স্যারের মাথাটা বিগড়েছে।

তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা। নিয়ম অনুযায়ী আবার আমার নাইট শিফট। তিনরাত কাটিয়েও ফেলেছি, এবং কোনো ভাম, বাঁদর, ঢিল, পেয়ারা কোনোকিছুরই অত্যাচার হয়নি। সেদিন বৃহস্পতিবারের রাত, চতুর্থ রাত্রি জাগরণ। সেই নিষিদ্ধ দেওয়ালের সামনে ছিল আমাদের তেলের বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক। যে তেলে চিপ্স ভাজা হয়। রাতে তেলের মাপ নিয়ে ফিরছি। হাতে যথারীতি টর্চ আর লাঠি। অনেকেই ভাববেন যে, কারখানা চলছে, বাকি লোক কই? তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, গরমকালে যে কোনো কারখানায় রাতে গিয়ে দেখবেন, প্রায় সবাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্যাকিং-এর ঘর, বা ল্যাবরেটরি ছেড়ে নড়ে না। অন্ধকার গরমের রাতে, কার আর আমার মতো ঘুরে বেড়াবার শখ জাগে?

সেই মাপ নিয়ে ফিরছি, প্রায় অফিসের গেঁটের সামনে পৌঁছেছি, পিছন ফিরে দেখি কিছুটা দূরে, সেই দেওয়াল এর দিক থেকে একটা বেঁটে ছায়ামূর্তি হেঁটে বয়লার রুমের দিকে চলে যাচ্ছে। বয়লার তো বন্ধ, নিশ্চয়ই কোনো লেবার, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ওর পিছনে গেছে। ওই জায়গাটা নোংরার ডিপো। যত আস্তাকুঁড় আর লেবার স্থানীয় লোকেরা ওখানে পৈটিক নিষ্কাশনের কাজ সেরে আসে দিনের বেলা। বাবাহ, এদের সাপের ভয়ডরও নেই, রাতের বেলা চলল ওখানে। মানুষটা ছোট, খানিক বামনের মতো আকার, এবং সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। নিশ্চয়ই ঝাড়ুদার পবন, ও-ই ওরকম ছোটখাটো দেখতে।

এরপরেও মাসখানেক রাতের বেলা মাঝে মাঝেই দেখতাম পবনকে ওদিকে যেত। ছায়ার মতো, চুপিচুপি। তখন মাসের শেষ, সেই মাসে প্রোডাকশনের চাপও কম। বেশিরভাগ মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হচ্ছে। সব্বাইকে ডেকে সাধারণ ট্রেনিং দিচ্ছি খাদ্য সুরক্ষা, সাধারণ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে। কেউ কেউ শুনছে, কেউ কেউ শুধু তাকিয়ে শোনার ভান করছে। ট্রেনিং-এর মধ্যেই প্রসঙ্গ উঠল পরিচ্ছন্নতার, এবং আজকের দিনে মাঠেঘাটে শৌচ না করার উপকারিতার। তখন কথায় কথায় পবনের দিকে তাকিয়ে আমি বলেই ফেললাম, "এই যে মাঝরাতে তুমি পেট খালি করতে জঙ্গলে যাও, এটায় শুধু যে তোমাকে সাপ-খোপ কামড়াতে পারে তাই নয়, তোমার শরীর খারাপও হতে পারে।"

পবন হাঁ করে গ্রাম্য ভাষায় খানিক হাত-পা নেড়ে যা বোঝাল, তার মানে হয় যে, সে কোনোদিনই রাতে ওই নোংরা জায়গায় যায় না। সকলেই তখন স্বীকার করতে শুরু করল, রাতে ভয়ে কেউ ওদিকে যায় না। গ্রাম্য মানুষ সব, সন্ধে হতেই ঝোপঝাড়ে ভূত দেখে। আমি ভাবলাম, ধরা পড়ে সব মিথ্যা

বলছে।

কিন্তু ইলেক্ট্রিশিয়ান সৈকত এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, "স্যার কি ওদিকে কিছু দেখেছেন নাকি?"

বেশ রহস্যময় সুরে জিজ্ঞেস করাতে, আমার সন্দেহ হল। নিশ্চয় এ কিছু জানে।

আমি বললাম, "কে যায় বলো তো?"

উত্তরে সে আমায় প্রস্তাব দিল, "এক কাজ করুন, সামনের নাইট শিফটে আমাদের সঙ্গে থাকুন। জানিয়ে দেব কে যায়। অবশ্য এক রাতেই ধরতে পারবেন মনে হয় না।"

দেখতে দেখতে রাতের শিফট এসেও গেল। কারখানা সেদিন বন্ধ, শুধু কিছু রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, ব্যস। ইলেক্ট্রিশিয়ানদের কাজের রুম ছিল বয়লার রুমের উল্টোদিকে একটু অফিস ঘেঁষে। গিয়ে দেখি তারা এলাহি আয়োজন করেছে রাতের জন্য। মুড়ি, ভাজা পেঁয়াজ, চানাচুর, সিঙ্গারা, আলুর চপ আরো কতকিছু মেখে রাতের টিফিনের ব্যবস্থা করেছে।

আমি গিয়ে বললাম, "আজ তো ফ্যাক্টরি বন্ধ, আজ আর কাকে ধরব?"

সৈকত ও আরো তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে স্যার, একদিন এই গরিবদের সঙ্গে একটু মুড়ি ফিস্ট করে যান। কত আর কাজ করবেন?"

মহানন্দে মুড়ি সহযোগে মধ্যরাতীয় আড্ডা চলতে লাগল। রাত জাগার একটা নেশা থাকে, সেই নেশা যারা জাগেনি তারা বুঝবে না। যখন সমস্ত পৃথিবী শুয়ে পড়ে, ঝিঁঝিঁ পোকা সমানে ডেকেই চলে আর মাঝে মাঝে ওই হাইওয়ে দিয়ে লরি হু হু করে চলে যায়, তখন মনে হয় না একটা শহরের কাছে আছি।

একথা সেকথা চলছে আমাদের পাঁচজনের। পূর্ণিমার রাত, তাই লাইটগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু অফিসের লাইট জ্বলছে একটু দূরে। আমি কী একটা হাসির কথা সবে বলতে গেছি, এমন সময় রাজু আমায় হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওই দেখুন স্যার..."

তাকিয়ে দেখি সেই বামন ছায়ামূর্তি। সামনের দিকে ঝুঁকে চলছে। খুব সন্তর্পণে, এদিক ওদিক দেখে এগিয়ে আসছে। সবাই যেন নিঃশ্বাস আটকে দেখছে। চারিদিকের হাওয়া বাতাসও যেন থম মেরে মৃত্যুপুরীর মতো অপেক্ষা করছে। ব্যাপার কী? আজ তো কারখানা বন্ধ, এটা কি তবে চোর? রোজ রাতে আসে? হাঁটাটাও একটু অদ্ভুত। মানুষের মতোই অবয়ব, কিন্তু হাঁটছে ভাল্লুকের মতো।

"যখী..." ফিসফিস করে বলল সৈকত।

আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম। সে আবার কী জন্তু?

"যখী স্যার... ওটা যখী... ভূত..." সৈকত আবার বলল।

"হোয়াট ননসেন্স..." বলে আমি সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমি কলকাতার ছেলে, এসব ছেলেভুলানো গল্প আমার কাছে চলবে না। ছায়ামূর্তি এবার ওই নোংরা জায়গার দিকে বেঁকে গেল। আমি তিরের মতো পিছনে দৌড়ালাম। হাতে টর্চ। ধরতেই হবে ওটাকে, চোর হোক বা ভূত হোক। এর শেষ দেখেই ছাড়ব। পিছনে ছেলেগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার যাবেন না..."

আমি ততক্ষণে বয়লার রুম পেরিয়ে গেছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। নোংরা জায়গা থেকে একটা ঝোপের পিছন থেকে উঁকি দিল সেই নীল চোখ। টর্চের আলো ফেলতেই আবার সেই হাসি মাখা অদ্ভুত মুখ। এবার প্রথম দেখলাম হাতদুটো। অসম্ভব রোগা, কিন্তু মানুষের মতোই হাত। আমি আরো এগোতেই যাব, পিছন থেকে খপ করে ধরল ছেলেরা। সৈকত, রাজু, পাণ্ডে আর গৌতম। চারজন মিলে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে আনল আমায় অফিসে। এসে দিল চেয়ারে বসিয়ে।

"এটা কী হল?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে সৈকত ভয়ার্ত চোখে আমার পায়ের কাছে বসে বলল, "স্যার যা যা দেখেছেন সত্যি করে বলুন, ও কিন্তু শয়তান..."

"কে শয়তান?" আমি রাগত হয়ে বলি।

"যখী... স্যার আপনার বিশ্বাস করবেন না। ওটা যখী..."

"ধুর বাবা..." আমি বিরক্ত হই, "যখীটা কী?"

"স্যার ওই যে কোনো ধনী বা রাজা নিজের ধনরত্ন একটা মাটির তলায় ঘরে রেখে, সঙ্গে বাচ্চা ছেলে কবর দেয়, সেই অপদেবতা..."

"সে তো যখ..." আমি বলে উঠি। হেমেন্দ্রকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ আরো কত বিখ্যাত লোক এদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, 'যখ' জানব না? আমি বলতে থাকি, "কিন্তু সে তো সাপ হয় শুনেছি..."

"এক এক জায়গায় এক একরকম..." গৌতম বলে ওঠে, "ওকে আমরাও প্রায়ই দেখি, এবার বলুন তো স্যার, আপনি কী কী দেখেছেন?"

আমি প্রথম দিন থেকে সমস্ত কিছু বলে দিলাম। পেয়ারার ঘটনাও বাদ দিলাম না।

সব শুনে সৈকত বলল, "একটা কথা বলছি স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনি চোখ দেখেছেন, হাসি দেখেছেন। আমরা কিন্তু কেউ কোনোদিন ওর কালো মুখ আর কালো শরীর ছাড়া কিছু দেখিনি। মুখে আলো পড়লে, লোমে ঢাকা চেহারা দেখি। ল্যাজ একটা আছে, কিন্তু ওর আকার মানুষেরই মতো। যত নোংরা, উচ্ছিষ্ট জিনিসের কাছে থাকে ও। ওই নিষিদ্ধ জায়গায় ওর বাস, কিন্তু গেলে দেখতে পাবেন না। কেউ পিছু নিলে কোথায় মিলিয়ে যায়।"

"কারো কোনো ক্ষতি করেছে কি?"

"নাহ..." ছেলেরা জবাব দেয়, "তবে কে আর ভূত দেখে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে যায় বলুন? আপনিই প্রথম যে ওর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করেছেন। ও বোধহয় আপনাকে খেলার সঙ্গী পেয়েছে।"

তারপর চারজনেই প্রায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কাকুতি মিনতি করে ওঠে, "স্যার কথা দিন, ওই মায়াবীকে কোনোদিন কোনোরকম প্রশ্রয় দেবেন না। অপদেবতা স্যার, কী ক্ষতি করবে কে জানে। কথা দিন স্যার... আপনার ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে..."

সহজ সরল লোকগুলোর অনুরোধে কথা দিয়েই দিলাম। এই কাহিনির এখানেই শেষ। না, মনগড়া গল্পের মতো আমি কোনোদিন অজ্ঞানও হইনি, কোনো গ্রাম্য বৃদ্ধ এসে আমায় কোনোদিন ওই যখের ব্যাপারে গল্পও শোনায়নি। বাস্তবের ঘটনায় কোনো ব্যাখা পাওয়া যায় না। এই ঘটনার পরেও প্রায় দেড় বছর ছিলাম ওখানে। রাতের বেলায় মাঝেমাঝে এক আধটা ঢিল, পেয়ারা বা অন্য কিছু এসে পড়ত পায়ের কাছে। কখনও কখনও সেই ছায়ামূর্তিকে দেখতাম হেঁটে চলে যাচ্ছে নোংরা জায়গাটার দিকে। কিন্তু কথা দিয়েছি, তাই কোনোদিন জানালার দিকে তাকিয়ে দেখিনি, আর ছায়ার পিছুও নিয়নি। জানি না, আমার ভাবনাটা ঠিক কিনা, কিন্তু অপদেবতা হোক আর যাই হোক, সে যদি সত্যি যখ হয়েও থাকে, তাহলে কত কষ্ট পেয়ে সেই শিশুটা তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এরকম রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা ভেবে মন হু হু করে উঠত। ভয়ে তার কাছে কেউ যায় না। বেঁচে থাকতে অবহেলা মৃত্যু দিয়েছে, মৃত্যর পরেও সেই অবহেলা ওর পিছু ছাড়েনি। হয়তো সেই মায়াবী আমার কাছে কিঞ্চিত সঙ্গ আশা করেছিল। শিশুই তো। জীবিত হোক বা মৃত।

***

খোক্কস

'বেড়ালটা জ্বালাল দেখছি... পায়ে পায়ে খালি লটপট করছে...' ভেবেই জ্যোৎস্না এক লাথি মারে বেড়ালটাকে। এমনিতেই কুসুম্বা গ্রাম পৌঁছাতেই বিকেল হয়ে গেল, এখন পলশা ফেরত যেতে কত রাত হবে কে জানে। দোষটা জ্যোৎস্নার নয়, এমনকি পার্টি অফিসেরও না। তারা যে পাঁচটার পরেও অফিস খুলে তার কাগজটা সই আর স্ট্যাম্প করে দিল, তাই অনেক। পলশায় তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আর থাকা যাচ্ছে না। স্বামী গত হওয়ার পরে স্বামীর ভাইয়েরা সবই ছিনিয়ে নিয়েছে। ভাগ্যি বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। একটা ঝামেলা কমেছে। জ্যোৎস্নার ইচ্ছে, সে ছেলে-মেয়ে নিয়ে রামপুরহাটে চলে যাবে। রেলপাড়ে একটা জায়গাও দেখেছে, সেখানেই থাকবে আর সেলাইয়ের দোকান দেবে। সেলাইয়ের জামার খুব চল।

সময়টা ষাটের দশকের শেষ, সত্তরের শুরুর দিক। আজকেই কাগজটা আনতে পারলে এই সপ্তাহের শেষের মধ্যে জায়গাটার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। সেইসব ভেবে, ছেলেমেয়েকে রেখে, জ্যোৎস্না বেলা দশটাতেই বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। ইচ্ছে ছিল দুপুর বিকেলের মধ্যে কাগজটা নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু পথে বাধা ছিল। মারগ্রাম-এর ভিতর দিয়ে যখন হনহন করে জ্যোৎস্না চলেছে তখনই দেখল সাগরদের ঘরের সামনে ভিড়। সাগরবাবু তার স্বামীর বন্ধু। উচ্চৈস্বরে কান্নার আওয়াজ ও বিলাপ শুনে, একটু এগিয়ে ভিড় ঠেলে ঢুকতেই জ্যোৎস্না ব্যাপারটা বুঝে গেল। সাগরবাবু আর নেই!

গ্রাম্য বাড়ির উঠোনের মাঝে সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে শোয়ানো আছেন সাগরবাবু। একদিকে বাড়ির মেয়েরা বুক চাপড়ে কাঁদছে, এবং যতবার চেনা কারো আগমন হচ্ছে ততবার নতুন করে আরো উচ্চ স্বর হচ্ছে। জ্যোৎস্নাকে দেখেও তাই হল ।

'ওগো দিদি গো, দেখো না গো, মানুষটা চলে গেল গো...'

জ্যোৎস্না একটু বসল পাশে। হাতে সময় আছে। সাগরবাবুর বৌ'কে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিল। আহা রে, সত্যি তো দুঃখের বিষয়। যতদিন বেঁচে ছিল মানুষটাকে দু'দণ্ড শান্তি দেয়নি বৌ'টা। জিভ যেন করাতের মতো, যেতে আসতে কাটত। দিনে কম করে সাতবার 'মরলে বাঁচি' বলত, আর আজ যে

লোক দেখানো নাটক করছে সেটা সাত গ্রামের কারো জানতে বাকি নেই। লোকটা প্রায় না খেয়ে আর চিকিৎসা না পেয়ে মরল। অথচ কত খেতে ভালোবাসত মানুষটা। জ্যোৎস্নার স্বামীর সঙ্গে কতদিন এই বড় বড় মাছ ধরে এনে কত হুল্লোড় করেই না খেয়েছে। সেই লোকটা সেই যে চাকরিতে কী একটা আঘাত পেয়ে পায়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে রইল, যেন সংসারের লোকের দু'চোখের বিষ হয়ে গেল। সরকারি চাকরি ছিল, পেনসন পেত। তাতেও সংসারে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকত। আজ মানুষটা মুক্তি পেল।

মৃতদেহ খড়ের খাটে বাঁধা হচ্ছে। পাশে পাড়ার ছেলেপুলে খাটছে। ধূপ দেওয়া, তুলসীপাতা, খই জোগাড়, সবই তারা করছে। সাগরবাবুর বড় ছেলে আড়ালে বিড়ি টানছে সেই ছেলেদের সঙ্গেই, আর চারটি আরো ছেলেপুলে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে লাট্টু। বাবা শ্মশান গেলেই সে আবার খেলায় মন দেবে, এরকম ভাব। কেউই বিশেষ দুঃখ টুঃখ পাচ্ছে না। জ্যোৎস্নাও প্রায় বছরখানেক পর এদের দেখল। যে মানুষটার বন্ধু, সেই নেই, তখন এদের সঙ্গে আর কীসের সম্পর্ক?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। গ্রামের মোড়ল ও পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়ে, পাঁচ সিকে নিয়ে বিধান দিয়ে গেল, 'বৌমা, এবার হাতে রঙিন চুড়ি আর রঙিন শাড়ি পরো না মা। আজ থেকে মাছ, মাংস, আমিষ ভক্ষণও নিষিদ্ধ।'

সেই শুনে আরেকবার কান্নার রোল উঠল। বোধহয় আগের থেকেও বেশি। জ্যোৎস্নার বোধ হল, স্বামী হারানোর থেকেও আমিষ হারানোতে বোধহয় বৌ'টা বেশি কাতর হয়ে পড়েছে।

শ্মশানযাত্রীরা ধীরে ধীরে 'বলো হরি, হরি বোল' কলরব করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে বাইরের রাস্তায় এল।

জ্যোৎস্না সেই ছেলেগুলোর একজনকে জিজ্ঞেস করল 'চাঁরাইলের শ্মশানে যাবি তো?'

'হ্যাঁ কাকিমা...' ছেলেটা উত্তর দিল, 'দু'টাকা মোটে দিয়েছে। ওই অন্য চিতায় উঠিয়ে জ্বালিয়ে দেব।'

গ্রামের গরিবদের এর থেকে ভালো সৎকার খুব কমই হয়। আলাদা চিতা সাজাবে তার কাঠ কই? পয়সা কই? অত্যন্ত গরিব হলে মুখো নুড়ো জ্বেলে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

'চল, আমি কুসুম্বা যাব, তোদের সঙ্গেই যাই... কুসুম্বার দিকেই তো...' জ্যোৎস্না বলল, এবং শ্মশানযাত্রী ছোট মিছিলের এর ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলল।

চাঁরাইল এসে, দলবল যখন বাঁ দিকে গেল, আর জ্যোৎস্না ডান দিকের রাস্তাটা ধরল, ততক্ষণে দুপুর অনেক গড়িয়েছে। বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছে